হীরকজয়ন্তী বর্ষে খগেনহাট নাথুনী সিং উচ্চবিদ্যালয়

শান্ত বর্মন

ডুয়ার্সের চা বলয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমারোহে ৬০তম বসন্তে পদার্পণ করবে নাথুনী সিং ছত্রী, বিজয়চন্দ্র রায় ও ডুকি বর্মনীর প্রতিষ্ঠিত খগেনহাট নাথুনী সিং উচ্চবিদ্যালয়। ১৪ ও ১৫ মার্চ আয়োজিত হবে স্কুলের হীরকজয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠান। ১৯৫০ সালের আগে চা বাগান ও নদীবেষ্টিত এই এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ ও দুর্গম হিসেবেই পরিচিত ছিল। আঁধার ঘনিয়ে এলেই বাড়ি থেকে বেরোনোর সাহস দেখাতেন না বাসিন্দারা। কিন্তু দিন দিন ওই এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এলাকায় পড়াশোনার উপযোগী পরিবেশ থাকলেও ছিল না কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যদিও এলাকার ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে পড়াশুনোর সুযোগ পেত। কিন্তু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হতে থাকে এলাকার মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সমাজের ছাত্রছাত্রীরা। ইতিমধ্যেই এলাকার শিক্ষানুরাগীরা এলাকায় শুরু করেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির আলোচনা। প্রথমে এলাকার সমাজসেবী তথা শিক্ষক নাথুনী সিং ছত্রী, বিজয়চন্দ্র রায় সহ শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তির সহযোগিতায় খগেনহাট বাজারে একটি অর্গানাইজেশন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন বিজয়চন্দ্র রায়। হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হয় পঠনপাঠন। স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষকের আসন অলংকৃত করেন বিভূতিভূষণ রায়চৌধুরি। ফের আলোচনা শুরু হয় কীভাবে অর্গানাইজেশন স্কুলটিকে একটি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত করা যায়, তা নিয়ে।

এরপর ১৯৫৮ সালের ২৯ অক্টোবর তৎকালীন বিধায়ক জগদানন্দ রায় ও প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর উপস্থিতে আলোচনা হয়। আলোচনায় একটি জুনিয়ার হাইস্কুলের স্থাপনের জন্য পাকাপাকিভাবে পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেসময়ে একটি কমিটিও গঠিত হয়। এলাকার শিক্ষানুরাগী জগন্নাথ রায় এই কমিটির সভাপতি, জমিদাতা নাথুনী সিং ছত্রী সহসভাপতি, বিজয়চন্দ্র রায় সম্পাদক এবং চণ্ডীচরণ রায় সহকারী সম্পাদক পদে মনোনীত হন। এরপর স্কুলের জন্য চাঁদা তোলা শুরু হয়। পাশাপাশি শুরু হয় স্কুলের জন্য সরকারি অনুমোদন পাওয়ার প্রক্রিয়া। সেই চেষ্টার সফল হন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতারা।

প্রথমে স্কুলের জমি সমস্যা মেটানোয় উদ্যোগী হন ডুকি বর্মনী ওরফে মোটা বুড়ি। তিনি এক একর জমি দান করেন। কিন্তু খগেনহাট থেকে দূরে হওয়ায় সেই জমিতে স্কুল তৈরিতে ফের সমস্যা হয়। এরপর সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসেন তৎকালীন স্কুল প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সহসভাপতি নাথুনী সিং ছত্রী। তিনি ১৪ বিঘা জমি দান করেন। তাঁর জমি দানের বিষয়ে তৎকালীন সম্পাদক রাধেশ্বর রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। নাথুনী সিং স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য এককালীন ৯০০০ টাকা দান করেন। সেই টাকাতে একটি পাকা ঘর তৈরি করা হয়। খগেনহাটে নাথুনী সিংয়ের এই দানের জন্যে তাঁর নাম অনুসারে স্কুলের নামকরণ করা হয় খগেনহাট নাথুনী সিং উচ্চবিদ্যালয়।

পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে জুনিয়ার হাইস্কুলের জন্য সরকারি অনুমোদন মেলে। তার এক বছর পর পঠনপাঠন চালু হয় উচ্চপ্রাথমিক পর্যায়ে। এভাবে প্রায় আট বছর কেটে যাওয়ার পর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস চালুর অনুমোদন দেয় শিক্ষা দপ্তর। ১৯৭৪ সালে বিদ্যালয় উচ্চপ্রাথমিকের চারটি শ্রেণির অনুমোদন পায়। ১৯৭৬ সাল থেকে নবম-দশম শ্রেণির পঠনপাঠন শুরু হয়। যদিও

সরকারি অনুমোদন আসে ১৯৮৪ সালে। সেসময়ে স্কুলে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় হাজারের কাছাকাছি, যাদের মধ্যে মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রী ছিল প্রায় ৬০ জন। ধীরে ধীরে স্কুলের ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। অর্থসাহায্যে এগিয়ে আসেন সাংসদ, জেলাপরিষদ সদস্য সহ বিধায়কগণ।

২০০৪ সালে এলাকাবাসীর সকলের আশা পূরণ হয়। ছাত্রছাত্রীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে শিক্ষা দপ্তর বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিকের অনুমোদন দেয়। শুরু হয় উচ্চমাধ্যমিকের পঠনপাঠন। ৬০ বছর আগে লাগানো সেই ছোটো চারাগাছ পরিণত হয় বৃহদায়তন একটি গাছে। বর্তমানে দু'হাজারের কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী আছে এই স্কুলে। স্কুলের পঠনপাঠন খেলাধুলার মান সহ বিভিন্ন বিষয়ে আপ্লুত হয়ে স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে ২০০৮ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ রাজ্যের একগুচ্ছ মন্ত্রী, শিক্ষা দপ্তর সহ অনেকেই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন।

খগেনহাট নাথুনী সিং উচ্চবিদ্যালয় এলাকার একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা ৬০ বছর ধরে এলাকার মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করছে। এই স্কুলের উপর ভরসা করে খগেনহাটের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রী সহ চা মহল্লার বহু ছাত্রছাত্রীও। যুগ যুগ ধরে আলোর ব্রতী হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা এই স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোর উন্নতি হয়েছে অনেকটাই। স্কুলে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রেণিকক্ষ, জেলার প্রথম এই স্কুলেই চালু হয় বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা। স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য রয়েছে উন্নত মুক্তমঞ্চ। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাইকেল স্ট্যান্ড রয়েছে। আছে গ্রন্থাগারও। এছাড়া মিড-ডে মিলের জন্য সুন্দর পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থাও আছে। স্কুলের পরিকাঠামোর একাংশ পরিপূরণ হলেও এখনও পূরণ হয়নি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বহু দাবিদাওয়া। তাই আগামী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে স্কুলের চাহিদাগুলি দ্রুত পূরণ হোক চাইছে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ অভিভাবকরাও। বহু পুরোনো এই স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এখনও বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়নি। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নেই, নেই নৈশপ্রহরীও। জিম, মিনি স্টেডিয়াম চালুর আশ্বাস সত্ত্বেও তা চালু হয়নি এখনও। জেলার অন্যতম বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হলেও ক্লার্কের সমস্যা রয়েছে। চলতি বছরেই বাকি একজন ক্লার্ক অবসর নেবেন। ফলে স্কুলের অফিসের যাবতীয় কাজ সামলানোয় সমস্যা দেখা দেবে।

১৯৭৫ সালে এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভরতি হই। সেসময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না। বাড়ি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে স্কুল ছিল। তবুও স্কুল ফাঁকি দিতাম না। ১৯৮১ সালে এই স্কুল থেকে চতুর্থ ব্যাচে মাধ্যমিক পাস করি। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যেতে হয় ডাউকিমারি উচ্চবিদ্যালয়ে। সাফল্য পাওয়ার পর শালকুমারহাট হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করি। তারপর ১৯৮৮ সালে এই স্কুলেই শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই। আমার সাফল্যের পিছনে স্কুলের শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শৈশব থেকে যৌবন কেটেছে এই স্কুলে, বাকি দিনগুলিও এই স্কুলে কাটাতে চাই। সেইসঙ্গে স্কুলের সাফল্য কামনা করি।

– **আবুল কাশেম,** *শিক্ষক*

আমরা খগেনহাট নাথুনী সিং উচ্চবিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে মাধ্যমিকের ছাত্রী ছিলাম। সেসময়ে আমার বাবা জহিরুদ্দিন আহমেদ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বাবাও আমাকে স্কুলে পড়াতেন। আমাদের সময়ে এলাকায় আর কোনো স্কুল ছিল না। পড়াশোনার জন্য প্রাইভেট টিউশন ছিল না, পুরোটাই স্কুল নির্ভর ছিলাম। স্কুলকে ভীষণ ভালোবাসি। সেসময়ে ছাত্র-শিক্ষক মেলবন্ধন অটুট ছিল। আমরা স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতাম, ভয়ও পেতাম। শিক্ষকরা আমাদের ভালোবাসতেন। আবার পড়া না হলে শাসনও করতেন। স্কুলের ৬০তম বর্ষের সাফল্য কামনা করি। সেইসঙ্গে স্কুলের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

– **শবনম মুস্তাফি,** *শিক্ষিকা*

এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলাম। স্কুলের পরিচালন কমিটির পদে দীর্ঘ ১৮ বছর কাটিয়েছি। প্রথম পরিচালন কমিটিতে যুক্ত হওয়ার সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুভাষ সেনগুপ্ত। সেসময়ে স্কুলের দোতলা ভবন তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন শ্রীবাস রায়। তাঁর আমলে স্কুলের বাউন্ডারি তৈরি করা হয়। সাংসদ পীযূষ তিরকির উন্নয়ন তহবিলের টাকায় একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়। তারপর বিধায়ক কুমারী কুজুরও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সেই অর্থে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিস তৈরি করা হয়। স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা চালু হয়।

– **সুনীলচন্দ্র রায়,** *যুগ্ম সম্পাদক, হীরকজয়ন্তী উৎসব কমিটি*

পড়ুয়াদের কথা

অতসী দাস, *নবম শ্রেণি*

সপ্তাহের ছয়দিনই স্কুলে আসি। বাড়ি থেকে স্কুল অনেকটাই দূর, তবুও স্কুল ছাড়া ভাবতে পারি না। একদিন কোনো কারণে আসতে না পারলে খারাপ লাগে। বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলা করতে আনন্দ পাই। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়াশোনা সহ সমস্ত বিষয়ে সহযোগিতা করেন। এই স্কুলে পড়ে নিজেকে ধন্য মনে হয়। আগামীদিনে এই স্কুলেই শিক্ষকতা করতে চাই এবং সুনাম অর্জন করতে চাই।

কণিকা রায়, *দশম শ্রেণি*

মাধ্যমিকের পড়া অনেক সময় বোধগম্য হয়ে ওঠে না। তখন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই সহজে তা সমাধান করে দেন। এজন্য আমাদের বেশি টিউশন পড়তে হয় না। স্কুলের সমস্ত অনুষ্ঠানে, সরস্বতীপুজোয় সকলে মিলে আনন্দ করি। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলেই মন কেমন করে। সকাল হলেই স্কুলের জন্য তৈরি হয়ে যাই। স্কুল ও পড়াশোনা ছাড়া কোনো কিছুই ভালো লাগে না। এই স্কুলে পড়েই আরও এগিয়ে যেতে চাই।

রাহিদা পারভিন, *একাদশ শ্রেণি*

স্কুলের সকলে মিলে পড়াশোনা-খেলাধুলা করে ব্যাপক আনন্দ পাই। ছোটো ছোটো পড়ুয়াদের নানা বিষয়ে আমরাও সহযোগিতা করি। তাই স্কুলকে বাদ দিয়ে কোনো ভাবনা আসে না। সবসময় স্কুলের ছবিই মনের মধ্য থাকে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই আমাদের ভালোবাসেন। আমরাও তাঁদের শ্রদ্ধা করি। শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় পড়াশোনায় ব্যাপক উৎসাহ পাই। তবে স্কুলে বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য ল্যাবরেটরি দরকার। তাতে আগামী ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান বিষয়ে আরও এগিয়ে যেতে পারবে।

শাহিদ আফ্রিদি, *একাদশ শ্রেণি*

একাদশ শ্রেণিতে পড়ার চাপ কম। কিন্তু আমরা তা মনে করি না। সবসময় সমানভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাই। যেকোনো সমস্যা হলেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে সহযোগিতা পাই। পড়াশোনার পর বাকি সময়ে খেলা করি। এজন্য আমরা প্রতিবারই জেলার খেলায় অংশ নিই। সেজন্য স্কুলে না এলে মন খারাপ হয়ে যায়। স্কুলের সমস্ত অনুষ্ঠান ও সরস্বতীপুজো জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপন করি প্রতিবছরই। তবে খেলাধুলার জন্য উন্নত ব্যবস্থা করা হলে ছাত্রছাত্রীরা আরও এগিয়ে যেতে পারবে।

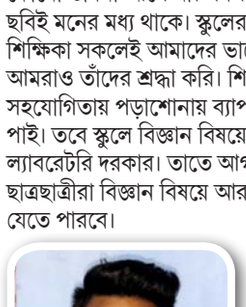

মিল্টন দাস, *(প্রাক্তন ছাত্র)*
এআরটিও, শিলিগুড়ি

দেখতে দেখতে স্কুলের অনেক বয়স হল। মনে পড়ে স্কুলের সেই দিনগুলির কথা। আমাদের সময় স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত চালু থাকলেও অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হত। সেসময় ২৫ বৈশাখ ও সরস্বতীপুজোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কেননা এই দুই দিনই নাটক হত। স্কুলের সমস্ত অনুষ্ঠানে সবাই মিলে অংশ নিতাম। আমাদের সময়ে স্কুলে তিন-চারদিনব্যাপী শিবির হত। শিবির শুরু হলে বাড়ি আসা হত না, স্কুলেই চাল-ডাল নিয়ে যেতাম। শিক্ষকরা ব্যাপক সহযোগিতা করতেন। আমাদের সময়ে স্কুলে নিয়মানুবর্তিতা বজায় ছিল। খালি পায়ে স্কুলে যেতাম। পড়া মুখস্থ না হলে শিক্ষকরা শাসন করতেন, আবার আদরও করতেন। সেই দিনগুলির কথা ভাবলে একটা আলাদা অনুভূতি হয়। মিস করছি সেই দিনগুলিকে।

হরিপদ রায়
সভাপতি, পরিচালন সমিতি

পরিচালন সমিতির দায়িত্ব পাওয়ার পর স্কুলে পরিকাঠামো থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টা করে চলেছি। প্রধান শিক্ষক সহ স্কুলের অন্য শিক্ষকদের শিক্ষাদানে অনুপ্রেরণা দিচ্ছি, যাতে তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের মতো করে ছাত্রছাত্রীদের মেধাবী করে তুলতে পারেন। স্কুলের ৬০তম বর্ষে সাফল্য কামনা করি। সেই সঙ্গে স্কুলের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

বলরাম সরকার
প্রধান শিক্ষক

শিক্ষাই আনে চেতনা, চেতনায় আনে বিকাশ, শিক্ষাদানের এই মহান ব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ৬০ বছর ধরে পালন করে আসছে খগেনহাট নাথুনী সিং উচ্চবিদ্যালয়। যার ফলে প্রত্যন্ত এলাকা আজ শিক্ষার আলোকে আলোকিত। এজন্য আমি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী, যাঁরা শিক্ষাদানের এই মহান কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বর্তমানে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু সমস্যাও রয়েছে। আমরা দ্রুত তা মেটানোর চেষ্টা করছি। সেই সঙ্গে অভিভাবক, পরিচালন সমিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষানুরাগীর মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল হোক। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষক হিসেবে নয়, একজন শিক্ষাদাতা হিসেবে এটাই কামনা করি।

পবিত্রকুমার রায়
সদস্য, পরিচালন সমিতি

১৯৯৮ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে ভরতি হই। তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬০০। স্কুলে পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল, তা সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিভাবকসুলভ আচরণে আমারা সুশৃঙ্খলভাবে পঠনপাঠন করেছি। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। আমি নবম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৩ কিমি হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতাম। বিশেষ কারণ ছাড়া ক্লাস ফাঁকি দিতাম না। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। স্কুলের দীর্ঘায়ু কামনা করি।